THE DHAKA
UNIVERSITY
JOURNAL
OF LINGUISTICS
@2025 Department of Linguistics

Vol. 18, No. 35, June 2025, P. 175-186
ISSN : 2789-3014, eISSN : 2075-3098
http://dx.doi.org/10.70438/dujl/1835/0008

হারমান হেসের সিদ্ধার্থ : গৎবাঁধা শিক্ষার প্রতি সংশয় এবং আত্ম-অভিজ্ঞতার তাৎপর্য অনুসন্ধান

রোজালীনা শ্যামা*

Abstract: Hermann Hesse (1877-1962) was one of the most important German writers of the early 20th century. He is a well-known German writer, poet and painter. He is one of the most widely read German language writers. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1946. He also received the Gottfried Keller Prize in 1936, the Goethe Prize in 1946, the Wilhelm Rabe Literature Prize in 1950 and the Peace Prize of the German Book Trade in 1955. He has travelled to almost every continent. His notable works include *Demian*, *Steppenwolf*, *Siddhartha* and *The Glass Bead Game*. His works often explore themes of spirituality, self-discovery, individual's own endeavors to break free from social constraints and individual's quest for meaning of life. Has Hermann Hesse also emphasized these themes in his famous novel *Siddhartha*? If so, to what extent and how he has emphasized these themes in *Siddhartha* will be discussed in this article. This novel, one of his most important stories and novels, was published in 1922.

Keywords: skepticism, quest for knowledge, self-realization, self-discovery, soul-searching, self-experience

১. ভূমিকা

হারমান হেসে (Hermann Hesse) ১৮৭৭ সালে জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি সুইজারল্যান্ডের নাগরিকত্ব লাভ করেন এবং ১৯৬২ সালে তিনি সুইজারল্যান্ডেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সাথে ভারত ও ভারতীয় সংস্কৃতির একটা সুনিবিড় ও গভীর সম্পর্ক ছিল এবং এই সম্পর্ক তাঁর লেখায় প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। হেসে তাঁর পরিবার থেকেই প্রথম ভারত সম্পর্কে ধারণা পান। ভারতের সাথে তাঁর সম্পর্কের প্রথম ধাপটা ছিল ১৮৭৭ থেকে ১৯০৪ পর্যন্ত। এই ধাপে ভারতীয় সংস্কৃতির

* প্রভাষক, জার্মান ভাষা, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।
E-mail : shayma_rozlin@yahoo.com

সাথে হেসের সংযোগটা ছিল অবচেতনভাবে। হেসের দাদা, বাবা এবং মা বহু বছর ভারতে মিশনারি হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁরা বেশ কিছু ভারতীয় ভাষা জানতেন এবং তাদের কাছে অনেক ভারতীয় জিনিস ছিল, যেমন জামাকাপড়, ছবি ইত্যাদি। দ্বিতীয় ধাপটা শুরু হয় ১৯০৪ সালে যখন তিনি জার্মান দার্শনিক Arthur Schopenhauer অধ্যয়ন করতে শুরু করেন। শোপেনহাওয়ারের লেখার মাধ্যমে হেসে ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির প্রতি অনুপ্রাণিত হন। ভারতীয় দর্শন, ধর্ম ও সংস্কৃতির সাথে তাঁর সম্পর্কের তৃতীয় ধাপ শুরু হয় যখন তিনি ভারত ভ্রমণে (১৯১১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত) বের হন। তাঁর এই ভ্রমণ ছিল তৎকালীন ইউরোপের সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে মানসিক মুক্তির একটা উপায়। তিনি তাঁর ওই সময়ের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্দশা অর্থাৎ ওই সময়ে চলা বিশ্বযুদ্ধ, জাতীয়তাবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ থেকে মানসিক মুক্তির বিকল্প হিসেবে নতুন কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। হারমান হেসে ১৯১৯ থেকে ১৯২২ এই সময় সীমার মধ্যে সিদ্ধার্থ (Siddhartha) উপন্যাসটি লিখেছিলেন। এই সময়টা ছিল ইউরোপীয় ক্লান্তির সময়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল খুবই নাজুক ও অস্থিতিশীল। দ্বিতীয়ত, শিল্পায়নের কারণে ইউরোপে মানুষের জীবন হয়ে পড়েছিল যন্ত্রের মতো। এসব কারণে সে সময়ের অনেক লেখকই মানসিকভাবে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁরা জীবনে একটা বিকল্প পথ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তাঁরা তখন এশিয়ার বৈচিত্র্যময় জীবন এবং ধর্মের মধ্যে সেই পথ খুঁজে পেয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, তিনি তাঁর লেখায় তৎকালীন কঠোর বাস্তব সমাজের যুবকদের প্রতিও দায়িত্ব নিয়েছিলেন,

> ভারতের প্রতি তাঁর আগ্রহ কেবল একটি সাধারণ সমসাময়িক প্রবণতাকেই তুলে ধরে না। তিনি লেখকের ভূমিকাকে এর সামাজিক প্রাসঙ্গিকতায় দেখেন, তিনি মানসিকভাবে তরুণদের সমস্যার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন, যারা যুদ্ধের ঘটনা দ্বারা মানসিক ও আত্মিকভাবে প্রভাবিত ছিল। এইভাবে তিনি এই যুগের অন্যান্য প্রতিনিধিদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। তাঁর ভারত ভ্রমণ এবং তাঁর সিদ্ধার্থ উপন্যাসের প্রকাশনার মধ্যবর্তী সময়ে হেসে তরুণদের সমস্যা নিয়ে কাজ করেছেন (Ganeshan, 1974: 56)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, লেখক হারমান হেসের সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতির একটা বিশেষ প্রভাব ছিল তাঁর লেখার মধ্যে। ওই সময়ে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউরোপের মানুষের মধ্যে যে বিষয়গুলো দেখা যেত সেগুলো হলো: জীবনের উদ্দেশ্যহীনতা, জীবনের লক্ষ্যের অনুসন্ধান, যা হারমান হেসের লেখার মধ্যে ফুটে ওঠে। হারমান হেসের লেখার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল: প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধান,

আত্ম-উপলব্ধি, আত্ম-আবিষ্কার, আত্মার সন্ধান, জীবনের লক্ষ্যের সন্ধান এবং সেই ক্ষেত্রে নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও কর্মের তাৎপর্য। বর্তমান প্রবন্ধে দেখা হবে এই বিষয়গুলো তাঁর বহুল আলোচিত এবং কালজয়ী সিদ্ধার্থ (Siddhartha) উপন্যাসে কতদূর দেখতে পাওয়া যায় এবং কীভাবে দেখতে পাওয়া যায়।

২. সাহিত্য পর্যালোচনা ও আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা

Ganeshan তাঁর লেখা বই *Das Indienerlebnis Hermann Hesses* (Ganeshan, 1974) তে হারমান হেসের *সিদ্ধার্থ* উপন্যাসের প্রতিটা উপাদান নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন তাতে হারমান হেসের ভারতীয় চিন্তাচেতনার প্রতিফলন কীভাবে ঘটেছে। Günter Baumann তাঁর *Hermann Hesse und Indien* (Baumann, 2002) প্রবন্ধের প্রথম অংশে ভারতের সাথে তাঁর পরিচয় এবং সম্পর্কের ধাপগুলো নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন এবং দ্বিতীয় অংশে তিনি দেখিয়েছেন- হেসের ভারতীয় গল্প সিদ্ধার্থ ভারত নিয়ে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার একটি কাব্যিক চিত্র এবং এই উপন্যাসকে তাঁর নিজের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভিজ্ঞতার সারাংশ হিসেবে বোঝা যেতে পারে। সাহিল কুমার তাঁর *Works of Hermann Karl Hesse : A quest for spirituality* (Kumar, 2022) প্রবন্ধে হারমান হেসের কিছু লেখা উদাহরণ হিসেবে নিয়ে তাতে দেখানোর চেষ্টা করেছেন, নির্ভানা অর্জনের যাত্রার চূড়ান্ত লক্ষ্য ও মাধ্যম - এই বিষয়টি হেসের লেখায় কীভাবে দেখানো হয়েছে। Hugo Ball তাঁর লেখা *Hermann Hesse. Sein Leben und sein Werk* বইতে হারমান হেসের জীবনী এবং তাঁর লেখা উপন্যাস *সিদ্ধার্থ* সহ আরও কয়েকটি উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। হুগো তাঁর এই গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় হেসের লেখা গল্পের কাহিনীর সাথে হেসের বাস্তব জীবনের যোগসূত্র দেখিয়েছেন (Ball, 1927) ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, একাধিক গবেষণায় গবেষকরা হেসের লেখায় তাঁর বাস্তব জীবনের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। অনেকেই সেক্ষেত্রে 'হেসের লেখায় তাঁর ভারতীয় চিন্তাধারার প্রভাব' নিয়ে কাজ করেছেন এবং উদাহরণ হিসেবে হেসের অন্যান্য লেখার পাশাপাশি বিশেষ করে তাঁর উপন্যাস সিদ্ধার্থ নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। তাই বর্তমান প্রবন্ধে সিদ্ধার্থ উপন্যাসে হেসের ভারতীয় চিন্তা চেতনার প্রতিফলন বিশ্লেষণ না করে বরং এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হবে। মূল চরিত্র ব্রাহ্মণপুত্র সিদ্ধার্থের জ্ঞানার্জনের যাত্রা এবং তাঁর জীবনের লক্ষ্য অর্জন ও আত্ম-আবিষ্কারের প্রক্রিয়া মূলত বর্ণনা করা হয়েছে সিদ্ধার্থ উপন্যাসে। সেই ক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে, হারমান হেসের

সিদ্ধার্থ উপন্যাসে জ্ঞান অন্বেষণের পথে সিদ্ধার্থ চরিত্রের গৎবাঁধা শিক্ষার প্রতি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কর্মের তাৎপর্য কতটা দেখতে পাওয়া যায়?

৩. গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে গুনগত আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Qualitative Content Analysis Method) এবং গবেষণার উৎস হিসেবে কাজ করেছে হেসের এবং হেসে বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ এবং কিছু গবেষণা প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে একটি উদ্ধৃতি ইংরেজি জার্নাল থেকে দেওয়া হয়েছে এবং সেটি ইংরেজিতেই রাখা হয়েছে। আর অন্যান্য যে উদ্ধৃতিগুলো এই প্রবন্ধে দেওয়া হয়েছে সেগুলো জার্মান বই থেকে দেওয়া হয়েছে এবং সেই উদ্ধৃতিগুলো প্রবন্ধকার নিজে জার্মান থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

৩.১. কোন তত্ত্বের আলোকে এই গবেষণা

যে তত্ত্বগুলোর আলোকে সাহিত্য গবেষণা করা হয়ে থাকে তাঁর মধ্যে পজিটিভিজম তত্ত্বের প্রয়োগ অন্যতম। বর্তমান প্রবন্ধে সাহিত্য গবেষণার কাজটি করা হয়েছে পজিটিভিজম (Positivism) তত্ত্বের আলোকে। সাহিত্য গবেষণায় পজিটিভিজম হলো কিছু নিয়ম নীতি ও পদ্ধতির সমন্বয় যা সাহিত্য ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে প্রয়োগ হয়। পজিটিভিজম তত্ত্বের জনক ফরাসি দার্শনিক এবং সমাজবিজ্ঞানী Auguste Comte (1798-1857)। ঊনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে তিনি তাঁর দর্শন আলোচনায় পজিটিভিজম তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য এবং ধরন নিয়ে আলোচনা করেছেন। Auguste Comte তাঁর এই পজিটিভিজম তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে দেখান সমাজবিজ্ঞানের আলোকে। আর সাহিত্য গবেষণায় পজিটিভিজম তত্ত্বের বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ করে দেখান জার্মান ভাষাতত্ত্ববিদ Wilhelm Scherer এবং ফরাসি ইতিহাসবিদ ও দার্শনিক Hippolyte Taine. Scherer এবং Taine দেখিয়েছেন, যদি আমরা একটি বই পড়ার আগে ওই বই এর লেখকের জীবনী সম্পর্কে জানি, তাহলে ওই লেখকের লেখা আরও ভালো করে বুঝতে পারবো। জার্মান ভাষাতত্ত্ববিদ Scherer এবং ফরাসি দার্শনিক Taine দুই জনেই সাহিত্য গবেষণায় পজিটিভিজম তত্ত্বের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ৩টি ধাপের কথা বলেন। (Hauff, Heller, Hüppauf, Köhn and Philippi, 1972) জার্মান ভাষায় ধাপগুলো হলোঃ Ererbte, Erlebte, Erlernte। আর ফরাসি ভাষায় ধাপগুলো হলোঃ Race, Milleu, Moment. Ererbte/ Race: Ererbte/ Race বলতে বোঝায় লেখকের ধর্ম, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, দৃষ্টভঙ্গি, জীবন দর্শন, তাঁর জীবনের

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং তাঁর সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি। Erlebte/ Milleu: Erlebte/ Milleu বলতে বোঝায় লেখক কোন স্কুলে পড়েছেন, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন, কী পড়াশুনা করেছেন, ইত্যাদি। Erlernte/ Moment: লেখক তাঁর Ererbte/ Race এবং Erlebte/ Milleu থেকে কী করেছেন, কী লিখেছেন বা কী অর্জন করেছেন।

Scherer এবং Taine (Hauff, Heller, Hüppauf, Köhn and Philippi, 1972: 41, 42) বলেছেন, পাঠক যদি লেখকের জীবনী অর্থাৎ লেখকের ধর্ম, বিশ্বাস, জীবন দর্শন, দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর জীবনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, তাঁর সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন, লেখক তাঁর জীবনে কী কী করেছেন, কোথায় পড়াশুনা করেছেন, কী পড়াশুনা করেছেন সেই সম্পর্কে জানেন, তাহলে ওই লেখকের বই ভালো বুঝতে পারবে। তাঁদের মতে লেখকের লেখায় তাঁর জীবনীর প্রতিফলন দেখা যায়। লেখক যা লিখেন তা মূলত লেখকের জীবনের প্রেক্ষাপট দ্বারা প্রভাবিত। লেখকের লেখা বুঝতে হলে তাই তাঁদের মতে প্রথমে লেখকের জীবনী সম্পর্কে জানতে হবে। সাহিত্য গবেষণায় তাঁদের মতে এটি খুবই কার্যকরী একটি তত্ত্ব।

৪. হেসের *সিদ্ধার্থ* উপন্যাসে গৎবাঁধা শিক্ষার প্রতি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি

সিদ্ধার্থ উপন্যাসে দেখা যায়, এই উপন্যাসের মূল চরিত্র ব্রাহ্মণ পুত্র সিদ্ধার্থ তাঁর পিতার কাছ থেকে এবং অন্যান্য পুরোহিতদের কাছ থেকে বেদ (পবিত্র ধর্মীয় শিক্ষা) শেখেন। কিন্তু এই শিক্ষা তাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তিনি আত্মার সম্পর্কে, আমি সম্পর্কে এবং জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে আরও জানতে চান। তিনি তাঁর মাতৃভূমি এবং তাঁর পরিবার ছেড়ে চলে যান। তিনি আত্ম-আবিষ্কারের সন্ধানে তাঁর বন্ধু গোবিন্দের সাথে বেরিয়ে পড়েন। তিনি প্রথমে সামানা হয়ে যান। তারপর তিনি কিছুদিন বুদ্ধদের জীবন যাপন করেন। এভাবে তিন বছর পার হয়ে গেল। কিন্তু তাতেও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। সিদ্ধার্থ ছিলেন জীবনের লক্ষ্যের সন্ধানে, আত্ম-আবিষ্কারের সন্ধানে। এই সন্ধানের পথে তিনি ছিলেন একদিকে নতুন কোনও শিক্ষার প্রতি উন্মুক্ত এবং অন্যদিকে সন্দিহান - “শিক্ষক ও মতবাদের প্রতি সংশয় এই লেখায় একাধিক বার দেখা যায়” (Ganeshan, 1974: 68)।

কেউ কেউ বলেন, সিদ্ধার্থ উপন্যাসের মূল চরিত্র সিদ্ধার্থের গৎবাঁধা শিক্ষার প্রতি সংশয়বাদের দৃষ্টিভঙ্গি আসলে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি লেখক হেসের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল,

> হেসে সমস্ত ধর্মীয় শিক্ষা এবং ধর্মীয় বিশ্বাস এর প্রতি সন্দিহান, সেগুলি বৌদ্ধ, হিন্দু বা খ্রিস্টান ধর্মই হোক না কেন। এবং এটি তাঁর জীবনের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। তাঁর মতে, আধ্যাত্মিক বিকাশ সর্বদা এগিয়ে নিয়ে যায় ভবিষ্যতের দিকে, নতুন, ব্যক্তিগত এবং উন্মুক্ত কোনও বিশ্বাসের দিকে। এই কারণে, হেসে তাঁর পাঠকদের বৌদ্ধধর্ম অনুসরণ করার পরামর্শ যেমন দেননি, তেমনি ইউরোপের বিদ্যমান গির্জাগুলির মধ্যে কোনোটাতেই যোগদান করার পরামর্শ তিনি দেননি (Baumann, 2002: 4)।

ব্রাহ্মণ পুত্র হিসেবে সিদ্ধার্থ একটি সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলেন। তাঁর বাবার আশা ছিল, সে একজন ভালো পুরোহিত হবে। কিন্তু সিদ্ধার্থ গোঁড়ামিতে বিশ্বাস করতেন না। তিনি ব্রাহ্মণদের শিক্ষাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতেন এবং নতুন শিক্ষার জন্য উন্মুক্ত ছিলেন। কেউ যদি নতুন শিক্ষার প্রতি উন্মুক্ত হয়, তবেই সে নিজের ধর্মীয় শিক্ষাগুলিকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখতে পারেন এবং অন্যান্য শিক্ষাগুলি যাচাই করতে পারেন। সিদ্ধার্থ নিজের ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়াও অন্যান্য শিক্ষা যাচাই করে দেখেছেন। তিনি কিছুদিন সামানাদের সাথে থেকে শিখেছেন, কিছুদিন বুদ্ধদের সাথে থেকে শিখেছেন। কিন্তু তিনি সকল শিক্ষককে সমালোচনা এবং সংশয় এর দৃষ্টিতে দেখেছেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের ধর্মীয় শিক্ষা, বুদ্ধদের শিক্ষা, সামানাদের শিক্ষা, কোনও শিক্ষাই যখন সিদ্ধার্থকে সন্তুষ্ট করতে পারলো না, তিনি তখন তাঁর জ্ঞান অন্বেষণের পথ ছেড়ে দিয়ে শহরে চলে গেলেন,

> আমি আমার চিন্তাধারা এবং জীবন আর শুরু করতে চাই না আত্মা এবং দুনিয়ার দুঃখকষ্টের সাথে। দুঃখকষ্টের আড়ালে রহস্য খুঁজে বের করার জন্যে আমি আর নিজেকে মেরে ফেলতে চাই না, আমি আর নিজেকে খন্ড বিখন্ড করতে চাই না। যোগ-বেদ, আথার্বা-বেদ, তপস্যা অথবা অন্য কোনও বিদ্যা আমাকে আর কিছু শিখাতে পারবে না। আমি শিখতে চাই আমার কাছ থেকে। আমি ছাত্র হতে চাই, আমি নিজেকে জানতে চাই, আমি জানতে চাই লুকায়িত সিদ্ধার্থকে (Hesse, 2006: 38)।

শহরে যাবার পথে তাঁর সুন্দরী কমলার সাথে দেখা হয় এবং তিনি তাকে তাঁর বন্ধু এবং শিক্ষক হওয়ার প্রস্তাব দেন। তিনি কমলার কাছ থেকে ভালোবাসা শিখতে চাইলেন। যেহেতু সিদ্ধার্থের কাছে কোনও টাকা নেই, সে সিদ্ধার্থকে শিক্ষা দিতে অস্বীকার করে। পরবর্তীকালে কমলা তাকে চাকরি পেতে সাহায্য করে। সিদ্ধার্থ একজন বণিকের জন্য কাজ করতে শুরু করেন এবং অর্থ উপার্জন শুরু করেন। তারপর তিনি কমলার কাছ থেকে প্রেমের শিল্প শিখতে শুরু করেন। তিনি অনেক ধনী হয়ে গেলেন, বাড়ি, বাগান, চাকর-বাকর সব কিছু অর্জন করলেন। এভাবে দীর্ঘদিন ধরে শহরে বসবাস করতে করতে ধীরে ধীরে একসময় এই জীবন তাঁর জন্য বিরক্তিকর হয়ে উঠলো। তিনি শহর ছেড়ে বনে চলে গেলেন। বনের এক নদীর তীরে অবশেষে একদিন তিনি আত্মা থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসা "ওম" শব্দের মাধ্যমে তাঁর জীবনের পরিপূর্ণতা, জীবনের অর্থ,

জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পেলেন। সিদ্ধার্থ নদীর তীরেই থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটেছে সেখানে। এখানে তাঁর সাথে এক বৃদ্ধ মাঝি বাসুদেব এর সাথে পরিচয় হয় এবং তার সাথে বন্ধুত্ব হয়।

এখানেই শেষ নয়, একদিন এই নদীর তীরেই তাঁর প্রাক্তন প্রেমিকা কমলার সাথে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় এবং কমলা তাঁর কোলে মারা যায়। মারা যাবার সময় সে সিদ্ধার্থকে তাদের ছেলেকে দিয়ে যায়। কিন্তু বড় হয়ে একদিন এই ছেলে তার বাবাকে ছেড়ে চলে যায় আত্ম-সন্ধানের পথে, ঠিক যেমনি সিদ্ধার্থ তাঁর বাবা-মাকে ছেড়ে গিয়েছিলেন।

গোবিন্দের সাথেও সিদ্ধার্থের দেখা হয় একদিন। এদিকে গোবিন্দ বুদ্ধ হয়ে গেছেন। কিন্তু তিনি এখনও আত্ম-সন্ধানের পথে। সিদ্ধার্থের সাহায্যে, গোবিন্দ অবশেষে নিজেকে আবিষ্কার করেন, তাঁর জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পান।

সিদ্ধার্থের আত্ম-আবিষ্কারের প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই আত্ম-আবিষ্কারের প্রক্রিয়ায় সিদ্ধার্থকে ব্রাহ্মণদের কোনও শিক্ষা, সামানাদের কোনও শিক্ষা, অথবা বুদ্ধদের কোনও শিক্ষা সাহায্য করতে পারেনি: "তিনি সত্যিকার অর্থে আগে এটিকে কখনই খুঁজে পাননি, কারণ তিনি এটিকে একটা মতবাদের আলোকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করছিলেন।" (Hesse, 2006: 46) সাহিল কুমার লিখেছেন: *Siddhartha insists that the path to true enlightenment is ultimately unteachable and comes from something intrinsic and unquantifiable; thus, enlightenment is impossible to teach.* (Kumar, 2022: 1566) তিনি তখনই মুক্তি লাভ করলেন যখন তিনি বাস্তবে নিজে সাধারণ মানুষের সাথে থেকে তাদের মতো করে জীবন যাপন করলেন এবং সেই সমস্ত কাজ শুরু করলেন যা অন্য আর সবাই করে,

> এটা ভালো, সে ভাবলো, মানুষের যা জানার দরকার তা তাকে নিজেকেই জানতে হয়। আমি ছোটবেলায় শিখেছি, দুনিয়া ও সম্পদের প্রতি লালসা ভালো জিনিস নয়। এটি আমি জানি দীর্ঘদিন ধরে, কিন্তু অনুধাবন করছি এখন। এখন আমি বুঝতে পারছি, আমি যে শুধু আমার স্মৃতি দিয়ে এটা জানি তা না, বরং আমার চোখ দিয়ে, আমার হৃদয় দিয়ে, আমার পেট দিয়ে। আমার জন্য ভালো যে, আমি এটা জানি! (Hesse, 2006: 88)

ব্যবহারিক বিদ্যায় ভুল করা স্বাভাবিক। ভুল ছাড়া, সংশয় ছাড়া কিছুই শেখা যায় না,

> পুনরায় ওম শোনার জন্যে পুনরায় ঠিক মতো ঘুমানোর জন্যে এবং ঠিকমত জেগে উঠতে পারার জন্যে, আমাকে হতাশার ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে, আমাকে ডুবে যেতে হয়েছে

> সমস্ত মূর্খ চিন্তার মধ্যে আর আত্মহত্যার চিন্তার মধ্যে। আমার মধ্যে পুনরায় আত্মা খুঁজে পেতে আমাকে বোকা হতে হয়েছে। আমাকে পাপ করতে হয়েছে পুনরায় বাঁচার জন্যে (Hesse, 2006: 86) ।

শুধুমাত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই তিনি শিখেছেন, ঘৃণা নয়, অন্যের প্রতি ভালোবাসা গুরুত্বপূর্ণ। আগে তিনি পৃথিবীকে ঘৃণা করতেন, কিন্তু এখন তিনি সবকিছুর প্রতি ভালোবাসা অনুভব করেন:

> ঘুমের মধ্যে এবং ওমের মাধ্যমে এই মুগ্ধতা তাঁর সাথে ঘটেছিল, যে তিনি সবকিছুকে ভালোবাসতে শুরু করলেন, তিনি যাই দেখছেন সেটার প্রতি তিনি আনন্দময় ভালোবাসায় পূর্ণ হতে শুরু করলেন। আর এই কারণে, এখন তাঁর কাছে মনে হচ্ছে, তিনি আগে এত অসুস্থ ছিলেন, যে তিনি কোনও কিছুই এবং কাউকেই ভালোবাসতে পারেননি (Hesse, 2006: 84)।

আগে তিনি নিজের প্রশংসা করতেন, নিজেকে জ্ঞানী বলে বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর চারপাশের লোকদেরকে ছোট বাচ্চা ভাবতেন,

> ...কিছু একটা ছিল যা তাঁকে তাদের থেকে আলাদা করে দিয়েছিল, এবং সেটা ছিল তাঁর সামানা জীবন যাপন। তাঁর কাছে মনে হতো, সব মানুষ বাচ্চাদের মতো বা পশুর মতো বসবাস করছে, যা তিনি একদিকে পছন্দ করতেন এবং একই সাথে তা আবার ঘৃণাও করতেন (Hesse, 2006: 64)।

কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার পরে এখন তিনি নিজেকে ঘৃণা করেন,

> না, আমি আর কখনও কল্পনা করবো না, যে সিদ্ধার্থ জ্ঞানী, যেমনটা আমি আগে কল্পনা করতে ভালোবাসতাম। তবে আমি একটা ভালো কাজ করেছি এবং এটা আমার ভালো লেগেছে, আমি এর জন্যে নিজেকে নিজের প্রশংসা করতে চাই, যে আমি অবশেষে নিজেকে এবং এই তুচ্ছ জীবনকে ঘৃণা করতে পেরেছি। (Hesse, 2006: 87)

নদী এই উপন্যাসে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা যা সিদ্ধার্থ নদীর কাছ থেকে পেয়েছেন সেটা হলো বাস্তব অভিজ্ঞতার তাৎপর্য। অন্যান্য শিক্ষকদের মত নদী সিদ্ধার্থকে কোনও পাঠ দিতে চায় না। নদীর সাহায্যে সিদ্ধার্থ তাঁর নিজের শিক্ষা নিজে অনুধাবন করেন। নদী কথা বলে শেখায় না, তার প্রবাহ শুনতে হয়, নদীর স্রোতের কলকল ধ্বনি শুনতে হয়, এবং তা নিজের ভিতরে নিতে হয়। অর্থাৎ নদীর কাছ থেকে তিনি শিখলেন, যে শুধু পুঁথিগত বিদ্যা কোনও কাজে আসে না, বরং কর্ম গুরুত্বপূর্ণ,

> যদিও বুদ্ধের শিক্ষা সিদ্ধার্থকে জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করতে পারেনি, যদিও তিনি বুদ্ধের পথ ত্যাগ করেছিলেন, যদিও তিনি বুদ্ধের শিক্ষার সাথে পুরোপুরি একমত হতে পারেননি, কিন্তু

> তিনি বুদ্ধদের খুব পছন্দ করতেন। বুদ্ধের জীবনের প্রতি তাঁর পূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল (Ganeshan, 1974: 66)।

এখানে বাস্তব অভিজ্ঞতার তাৎপর্য আবারও দেখতে পাওয়া যায়। সিদ্ধার্থ বুদ্ধের কথায় বিমোহিত হননি, বরঞ্চ বুদ্ধের কাজে বিমোহিত হয়েছেন: "হেসে বুদ্ধদের চিন্তা চেতনা নিয়ে আগ্রহী নন, যা তিনি আংশিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন, কিন্তু বুদ্ধদের জীবন নিয়ে তিনি আগ্রহী" (Ganeshan, 1974: 66)।

গোবিন্দের জ্ঞানার্জনের অনুসন্ধানেও বাস্তব অভিজ্ঞতার গুরুত্ব স্পষ্ট দেখা যায়। গোবিন্দ যখন জিজ্ঞেস করেন, সিদ্ধার্থ কিভাবে জ্ঞান লাভ করেন, সিদ্ধার্থ তাঁর জ্ঞান লাভের অভিজ্ঞতা বর্নণা করেন। কিন্তু তখন তিনি পুনরায় এই সত্য অনুধাবন করেন- বার্তা, কথা, তত্ত্ব গোবিন্দ অনুধাবন করতে পারছে না। গোবিন্দকে সবকিছুর অভিজ্ঞতা নিজে অর্জন করতে হবে, যেমনটা সিদ্ধার্থ নিজেই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

> গোবিন্দ এইভাবে আবারও এই বই এর কেন্দ্রীয় দার্শনিক বক্তব্যকে নিশ্চিত করেছেন, যে জ্ঞান কাউকে শেখানো যায় না এবং সিদ্ধি লাভ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা ইচ্ছা করে অর্জন করা যায় না, এটা একটা অনিচ্ছাকৃত, সহজাত প্রক্রিয়া (Baumann, 2002: 11)

সিদ্ধার্থ গোবিন্দকে বললেন তাঁর কপালে চুমু খেতে। এই চুম্বন সহজাত ভক্তির প্রতীক। এই চুম্বনের মাধ্যমে গোবিন্দ তাঁর জীবনের অর্থ খুঁজে পেলেন। সিদ্ধার্থ এইভাবে গোবিন্দকে সাহায্য করেছিলেন তাঁর জীবনের সিদ্ধি অর্জনে। কিন্তু গোবিন্দ তখনই সিদ্ধি লাভ করলেন, যখন তিনি তা নিজে উপলব্ধি করলেন। হারমান হেসে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন জ্ঞানার্জনের সন্ধানী, তিনি তাঁর জীবনের লক্ষ্য, জীবনের অর্থ খুঁজে বেড়িয়েছেন। যেই সময় হারমান হেসে তাঁর এই উপন্যাস লিখেছিলেন, সেই সময়টা ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়, এই সময়ের কিছু উল্লেখযোগ্য পরিস্থিতি ছিল এরকম: শিল্পায়ন, পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, উৎকণ্ঠার সময় (Age of anxiety), আত্মপরিচয়ের বিলুপ্তি (Loss of identity), বিচ্ছিন্নতা (alienation), অন্তরণ (isolation), ঘর হারা, পরিবার হারা (rootless), দুর্ভিক্ষ, অস্তিত্বের সংকট, মানসিক ক্লান্তি। এইরকম একটা উদ্বেগ আর জটিল পরিস্থিতির কারণেই এই সময়ে মানুষের ভিতরে একটা বিষয় কাজ করতো সেটা হলো- জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে না পাওয়া। সবাই যেন জীবনের লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেছিল এই সময়। সবার কাছে জীবন যেন হয়ে পড়েছিল অর্থহীন। হেসের সিদ্ধার্থ উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই, উপন্যাসের মূল চরিত্র সিদ্ধার্থও জ্ঞানার্জনের সন্ধানী। তিনিও তাঁর জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন, জীবনের লক্ষ্য

অনুসন্ধান করছেন। আর এই অনুসন্ধানের পথে তিনি ছিলেন গৎবাঁধা শিক্ষার বিরোধী আর নতুন শিক্ষার প্রতি উন্মুক্ত, স্থিরীকৃত এবং পূর্ব প্রনয়ণকৃত বাঁধা ধরা শিক্ষার প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সমালোচনামূলক। অবশেষে তিনি নিজেকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন, যখন তিনি তত্ত্ব, মতবাদ, বক্তৃতা আর ছকে বাঁধা সকল শিক্ষা ছেড়ে দিয়ে জীবনটাকে খুব কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করলেন। একমাত্র নিজের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাই তাঁকে তাঁর লক্ষ্য অর্জনের দিকে নিয়ে যায়।

৫. *সিদ্ধার্থ* উপন্যাসের সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা

ঐতিহাসিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সিদ্ধার্থ উপন্যাসের যেই বিষয়বস্তু, যেমনঃ আত্ম-উপলব্ধি, আত্ম-আবিষ্কার, জীবনের উদ্দেশ্য, জীবনের লক্ষ্য, বাস্তব অভিজ্ঞতার গুরুত্ব, নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা শিক্ষার প্রতি সংশয়, এসবের পিছনে একটা ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে। যেই সময়ে উপন্যাসটি লেখা হয়েছে সেই সময়ের অর্থাৎ ২০ শতকের শুরুতে যারা কঠিন যুদ্ধ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল, এই বিষয়গুলো ছিল তাদের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই বিষয়গুলো কালজয়ী এবং আমরা সকলেই কোনও একটা জায়গায় এসে, জীবনের কোনও না কোনও একটা সময়ে এসে সিদ্ধার্থের সাথে নিজেকে মেলাতে পারি, এই বিষয়গুলোর সাথে নিজেকে সংযুক্ত করতে পারি, যেহেতু আমরাও একটি উন্নয়নের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি এবং জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে আমরাও সবাই কমবেশি চিন্তা করি। সবসময় যেটা দেখা যায়, একদিকে যেমন ধর্মীয় গোঁড়ামি অন্যদিকে রাজনীতিক গোঁড়ামি সমাজের উন্নয়নের পথে প্রধান বাঁধা হিসেবে কাজ করে। পূর্ববর্তী প্রজন্ম সবসময় চেষ্টা করে পরবর্তী প্রজন্মকে পুরোনো মতাদর্শ আর গতানুগতিক ধ্যান ধারণায় সীমাবদ্ধ করে রাখতে, যাতে তাদের অস্তিত্বে নতুন প্রজন্ম প্রশ্ন তুলতে না পারে। সমাজের উন্নয়ন ও প্রগতির পথে এই বাঁধাকে ভেঙ্গে ফেলতে হলে, সমাজকে সকল গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করতে হলে, পুরোনো মতাদর্শের প্রতি সংশয়বাদ আর নতুন মতাদর্শের প্রতি উন্মুক্ত মনোভাবের বিকল্প নেই, যার সাথে সিদ্ধার্থ উপন্যাসের যথেষ্ট প্রাসঙ্গিকতা দেখা যায়। এছাড়া এই উপন্যাসটি তাদের সাহায্য করতে পারে যারা জীবন দর্শনে আগ্রহী এবং যারা জীবনের অর্থ নিয়ে ভাবছেন। তবে নিজেকেই অনুধাবন করতে হবে, নিজেকেই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। এই উপন্যাস শুধুমাত্র একটি সাহায্যকারী মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে।

৬. পর্যালোচনা

হেসের *সিদ্ধার্থ* উপন্যাস যুগ যুগ ধরে চলে আসা পুরোনো গৎবাঁধা শিক্ষার বিরুদ্ধে একটি স্পষ্ট অবস্থান নেয় এবং ব্যক্তির আত্মার বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজের কর্ম ও অভিজ্ঞতার গুরুত্বের উপর জোর দেয়। উপন্যাসের মূল চরিত্র সিদ্ধার্থের অভিজ্ঞতাগুলি স্পষ্ট করে যে প্রকৃত জ্ঞান এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি গোঁড়ামিমূলক ধ্যান ধারণার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না। উপন্যাসটি ব্যাখ্যা করে যে জ্ঞানার্জনের পথ কোনও সরল রেখা বা সহজ কোনও যাত্রা নয়, বরঞ্চ একটি কঠিন, গতিশীল ও চলমান প্রক্রিয়া। সিদ্ধার্থ উপন্যাসে হেসে দেখান, সত্য এবং প্রজ্ঞার সন্ধান গভীরভাবে ব্যক্তির নিজের বিষয়। স্থিরীকৃত মতাদর্শের প্রতি সংশয়বাদ ও সচেতনতা এবং আত্ম-অভিজ্ঞতার উপর জোর দিয়ে,

উপন্যাসটি গতানুগতিক শিক্ষার সীমাবদ্ধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। সিদ্ধার্থ উপন্যাস ব্যক্তির নিজের অস্তিত্ব অনুধাবনের ক্ষেত্রে এবং জীবনের অর্থ অনুসন্ধানে ব্যক্তির নিজস্ব লড়াই এর প্রয়োজনীয়তার নির্দেশনা দেয়। বর্তমান বিশ্বে সিদ্ধার্থ উপন্যাসের এই মূল বার্তার যথেষ্ট প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, যেখানে প্রায়শই স্থিরীকৃত মতাদর্শ এবং পদ্ধতি অনুসরণের প্রবণতা দেখা যায়।

৭. উপসংহার

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, পুরো সিদ্ধার্থ উপন্যাস জুড়ে এই ধারণা বিরাজ করে যে, কারও কথার চেয়ে, কোনও মতবাদের চেয়ে, কারও দেওয়া বক্তৃতার চেয়ে, গোঁড়া ধর্মীয় শিক্ষার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আত্ম-উপলব্ধি আর ব্যক্তির বাস্তব অভিজ্ঞতা। হেসে দেখান, সত্যিকারের জ্ঞান এবং পরিপূর্ণতা কেবলমাত্র তখনই সম্ভব, যখন ব্যক্তি নিজের পথ নিজেই অনুসন্ধান করবেন। উপন্যাসে আত্ম-অভিজ্ঞতার গুরুত্ব সিদ্ধার্থ উপন্যাসকে তার সময়ের অন্যান্য আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক কাজ থেকে আলাদা করে এবং উপন্যাসটিকে একটি কালজয়ী প্রাসঙ্গিকতা দেয়। আধুনিক আধ্যাত্মিক এবং দার্শনিক ধারার প্রেক্ষাপটে সিদ্ধার্থ উপন্যাসটিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং আত্ম-অনুসন্ধানের সমসাময়িক আলোচনায় হেসের কাজ কী ভূমিকা পালন করে, তা নিয়ে ভবিষ্যতে গবেষণার কাজ করা যেতে পারে। হেসের সিদ্ধার্থ উপন্যাস আমাদের দেখায় যে জীবনের সত্য ও প্রজ্ঞা কোনও পূর্বনির্ধারিত শিক্ষার মাধ্যমে পাওয়া যায় না; বরং তা অর্জিত হয় ব্যক্তির নিজের অভিজ্ঞতা, সংগ্রাম ও আত্মঅনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে। এই উপন্যাসের মূল বার্তা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক, কারণ এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে নিজস্ব পথ ও অভিজ্ঞতাই প্রকৃত অর্থে আত্মার বিকাশ ও জীবনের গভীর উপলব্ধির ভিত্তি।

তথ্যনির্দেশ

Ball, H. (1927) *Hermann Hesse. Sein Leben und sein Werk.* Berlin: S. Fischer Verlag.

Baumann, G. (2002) *Hermann Hesse und Indien*. Hesse Page Journal: Vol.III, Nr.7. Available from: http://www.gss.ucsb.edu/projects/hesse/papers/papers3.html

Ganeshan, V. (1974) *Das Indienerlebnis Hermann Hesse.* Bonn: Bouvier Verlag Herbert Grundmann.

Hauff, J., Heller, A., Hüppauf, B., Köhn, L. and Philippi, K.P. (1972) *Methodendiskussion. Arbeitsbuch zur Literaturwissenschaft.* Band 1, Frankfurt am Main: Athenäum Fischer Taschenbuch Verlag GmbH & Co.

Hesse, H. (2006) *Siddhartha.* Tübingen: Suhrkamp Taschenbuch Verlag.

Kumar, S. (2022) *Works of Hermann Karl Hesse: A quest for spirituality.* Journal of Positive School Psychology. Vol. 6, No. 7, 1565 – 1568. Available from: https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/11556/7476